গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ১৪ সংখ্যা | ১২ - ১৮ নভেম্বর ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

মহান নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে

৭ নভেম্বর মহান রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৪তম বার্ষিকী এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে গভীর মর্যাদা এবং শপথের মধ্য দিয়ে পালিত হল দেশ জুড়ে। দিনটি দলের সব অফিস সহ গ্রাম-শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মহান লেনিন ও স্ট্যালিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, পতাকা উত্তোলন, উদ্ধৃতি প্রদর্শনী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পালিত হয়। দলের শিবপুর সেন্টারে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ (ছবি)। কেন্দ্রীয় অফিসে মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। পলিটবুরো সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বহু কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। (আরও ছবি আটের পাতায়)

জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল প্রতিরোধে সর্বভারতীয় মঞ্চ গড়ার প্রস্তুতি

অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রগুলির মতো বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকেও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এ জন্য বিদ্যুৎ আইনে একের পর এক সংশোধনী নিয়ে আসছে তারা। সর্বশেষ যে সংশোধনীটি আনা হয়েছে সেটি হল বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী বিল-২০২১। চূড়ান্ত জনবিরোধী এই বিল বাতিলের দাবিতে ১০-২৫ নভেম্বর সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ-পক্ষ পালনের ডাক দিয়েছেন ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (ইসিএ)। কেন্দ্রের কৃষি আইনের পাশাপাশি এই বিদ্যুৎ বিল বাতিলের দাবিতে দীর্ঘ এক বছর ধরে দিল্লিতে ধরনা চালিয়ে যাচ্ছে সংযুক্ত কিসান মোর্চা (এসকেএম)। এবার রাজ্যে রাজ্যে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠিত করে এই আন্দোলন শক্তিশালী করতে দেশ জুড়ে পথে নামছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। সে জন্য এ রাজ্যের মতো সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের মঞ্চ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে দল। এখন দেখা যাক, এই বিলটি কেন জনবিরোধী।

১০-২৫ নভেম্বর
সারা ভারত প্রতিবাদ-পক্ষ

স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮ সালে প্রথম বিদ্যুৎ আইন তৈরি হয়েছিল। এতে বিদ্যুৎকে একটা পরিষেবা হিসাবে দেখা হত এবং উৎপাদন ব্যয়ের উপর মাত্র ৩ শতাংশ মার্জিন বা মুনাফা রেখে বিদ্যুৎ দেওয়া হত। এই অতিরিক্ত ৩ শতাংশ নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি ও পরিষেবা এলাকা বাড়ানোর জন্য নেওয়া হবে, এটাই ছিল দৃষ্টিভঙ্গি। সেদিন বিদ্যুতকেন্দ্র স্থাপনের জন্য কোনও বেসরকারি পুঁজি আসেনি। কোনও ব্যক্তিপুঁজির এত বিপুল মূলধন ছিল না যা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি ও পরিবহণের পরিকাঠামো করা যায়। তাছাড়া এখানে মুনাফা আসবে অনেক দেরিতে বলে বেসরকারি পুঁজি বিদ্যুৎ শিল্পে টাকা বিনিয়োগে রাজি ছিল না। এই অবস্থায় জনগণের ট্যাক্সের টাকায় সরকার এই বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি গড়েছে। সেই কারণে বিদ্যুতের মাশুল ছিল সামান্য।

এখন সরকার এই বিদ্যুৎক্ষেত্র পুরোপুরি বেসরকারি হাতে তুলে দিতে চাইছে। বিদ্যুৎকে পরিষেবা হিসাবে দেখার পরিবর্তে পণ্য হিসাবে দেখার জন্য আনা হয়েছিল বিদ্যুৎ আইন-২০০৩। এবার তাকে আরও মারাত্মক জনবিরোধী রূপ দিয়ে আনা হয়েছে বিদ্যুৎ বিল ২০২১। বলা বাহুল্য এর ফলে বিদ্যুতের মাশুল দ্রুত বাড়বে।

এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় কেমন হয়— ২০১৭-'১৮-এর বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ট্যারিফ অর্ডারে আছে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রি করেছে (টাকায়) কোলাঘাট-২.৪৬, বক্রেশ্বর-২.১৭, ব্যান্ডেল - ২.৭০, সাঁওতালডি-২.১৭, সাগরদিঘি-২.১৭।

দুয়ের পাতায় দেখুন

চিকিৎসায় স্বাস্থ্যসাথী বাধ্যতামূলক করার তীব্র প্রতিবাদ

এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৩ নভেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এক চিঠি দিয়ে চিকিৎসায় স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বাধ্যতামূলক করার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি বলেছেন,

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ২৫ অক্টোবরের নির্দেশিকা অনুযায়ী এখন থেকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তির জন্য সর্বসাধারণের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা বাধ্যতামূলক। ২০১৬ সালে চালু হওয়া এই কার্ড প্রথমে কিছু নির্দিষ্ট পেশার মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। ২০২০-র ডিসেম্বর থেকে তা চাকরিজীবী ছাড়া সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে এবং সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে চিকিৎসায় তা কাজে লাগানো যেত, কিন্তু বাধ্যতামূলক ছিল না। উপরোক্ত নির্দেশের ফলে ওই কার্ড বাধ্যতামূলক হল। অর্থাৎ ওই কার্ড ছাড়া কেউই সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে পারবে না। যদিও বলা হয়েছে যাঁদের কার্ড থাকবে না তাঁদের হাসপাতাল থেকে সঙ্গে সঙ্গে কার্ড তৈরি করে ভর্তি করাবে। এই কার্ডধারীরা পরিবার পিছু বছরে ৫ লক্ষ টাকার চিকিৎসা বিমার পরিষেবা পাবে। এই টাকার ১.৫ লক্ষ টাকা সরকার প্রিমিয়াম হিসাবে বিমা কোম্পানিকে দেয় এবং বাকি ৩.৫ লক্ষ টাকা অ্যাসিওরেন্স হিসাবে থার্ড পার্টি মারফত সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল নার্সিংহোমের চিকিৎসা বিল মেটায়। সরকারি দেয় টাকা আসত স্বাভাবিক ভাবে জনসাধারণের ট্যাক্সের মাধ্যমে। আপাতদৃষ্টিতে এই ৫ লক্ষ টাকায় বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ ভাল মনে হতে পারে। কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে যাঁরা এই পরিষেবা নিয়েছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা হল কর্পোরেট হাসপাতাল মালিকদের মুনাফার প্রয়োজনে সাদা-কালো-গোপন নানা বিলের মাধ্যমে ভর্তি হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই ৫ লক্ষ

সাতের পাতায় দেখুন

নিষ্ফলা ফুলকপি ঃ ক্ষতিপূরণের দাবিতে কৃষক বিক্ষোভ বাদুড়িয়ায়

উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়ায় ফুলকপির খেতে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ চাষিদের

অভাব অনটন-অশিক্ষা-বিনা চিকিৎসায় ধুঁকছে কৃষক পরিবারগুলো। সার-বীজ-ডিজেল সহ কৃষি উপকরণ অগ্নিমূল্য। জলের দরে ফসল বিক্রি চলছে। একের পর এক চাষে লোকসান। এই যখন অবস্থা তখন উত্তর ২৪ পরগণার বাদুড়িয়া ব্লকের চাষিদের দুর্দশা আরও বাড়াল ফুলকপি চাষ। গাছ হয়েছে, ফুলকপি হয়নি গাছে। মাথায় হাত চাষিদের।

পাঁচের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ বিল প্রতিরোধে দেশ জুড়ে আন্দোলন

একের পাতার পর

এর মধ্যে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে ১৫.৫ শতাংশ রিজিওনাল প্রফিট যুক্ত করা আছে। অর্থাৎ প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় গড়ে ২ টাকার কম। এর পর নতুন ট্যারিফ অর্ডার হচ্ছে এ বছর, যা এখনও জানা যায়নি। অথচ বেসরকারি টাটা পাওয়ার, বা আদানি গোষ্ঠী কিংবা অন্যরা প্রতি ইউনিটে উৎপাদন ব্যয় দেখাচ্ছে প্রায় আট টাকা। তারা বিদ্যুতের দাম বাড়াতে আরেকটা কৌশল নিয়েছে। তা হল, দেশীয় কয়লা ব্যবহার না করা। তারা দেশের কয়লা নিচ্ছে না, বিদেশ থেকে যে কয়লা আমদানি করছে সেখানে বহুগুণ বেশি দাম দেখিয়ে দিচ্ছে। কারণ এ ক্ষেত্রে তারা ক্যাগ (কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল)-এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বিদ্যুৎ থাকবে না যৌথ তালিকায়

এতদিন বিদ্যুৎ ছিল কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয়। নতুন বিদ্যুৎ বিলে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে একচেটিয়া কেন্দ্রীয়করণ করা হচ্ছে। অন্য দিকে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রকে বেসরকারি কর্পোরেট মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। রাজ্যের হাতে কী কী অধিকার আছে? নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ, বিদ্যুৎ বিল, খারাপ মিটার পরিবর্তন ইত্যাদি পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ, সর্বোপরি বিদ্যুতের মাশুল নির্ধারণ, সরকারি ভর্তুকি এ সবের নিষ্পত্তির কিছুটা অধিকার রাজ্যের হাতে এখনও আছে। এই বিলের মধ্যে দিয়ে তার সমস্তটা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দিল্লিতে, হাইকোর্টের সমতুল্য ক্ষমতার অধিকারী 'ইলেকট্রিসিটি কনট্রাক্ট এনফোর্সমেন্ট অথরিটি' নামের নতুন সংস্থাকে আনা হচ্ছে। এই 'অথরিটি' (ইসিইএ)-কেই বিদ্যুতের ক্রয়, বিক্রয় ও সঞ্চালন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের একচ্ছত্র অধিকারী করা হবে। রাজ্য সরকার ও রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ক্ষমতা এবং স্বাভাবিকভাবেই 'ওমবাডসম্যান'-এর মধ্য দিয়ে নানা সমস্যা ও কোম্পানির নানা অন্যায়ের প্রতিকারে গ্রাহকদের যতটুকু সুযোগ ছিল সেটিও কেড়ে নেওয়ার পাকা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই (ইসিইএ) অথরিটিকে হাইকোর্টের সমতুল্য অধিকার দেওয়ার ফলে নিম্নস্তরে ন্যায়বিচার না পাওয়া গ্রাহকদের যে কোনও সমস্যা নিয়ে একেবারে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে— যা কোনও সাধারণ গ্রাহকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। ফলে এই বিল আইনে পরিণত হলে বিদ্যুৎক্ষেত্রে নানা প্রকার জুলুমের প্রেক্ষিতে ন্যায়বিচার পাওয়ার যতটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার আছে, বিদ্যুৎগ্রাহকরা সেটাও হারাবেন। ব্যাপক গ্রাহক আন্দোলন ও দিল্লির সংযুক্ত কিসান মোর্চার লড়াইয়ের চাপে এই বিল সংসদে পেশ করতে না পেরে একটু পরিবর্তন করে আনা হয়েছে বিদুৎ আইন সংশোধনী বিল-২০২১।

শিল্পপতিদের মাশুল কমবে, সাধারণ গ্রাহকদের মাশুল বাড়বে

এই বিদ্যুৎ বিলে 'পারস্পরিক ভর্তুকি' (ক্রস সাবসিডি) তুলে দিয়ে সকলের মাশুল সমান করা হবে বলা হয়েছে। তাতে কার লাভ, কার ক্ষতি? বিদ্যুতের পরিকাঠামো তৈরিতে মোট ব্যয়ের ৯০ শতাংশ যাদের জন্য বিদ্যুৎ পৌঁছাতে খরচ হয়েছে, সেই বৃহৎ শিল্পপতিদের মাশুল কমবে, আর মাত্র ১০ শতাংশ পরিকাঠামো ব্যয়ে যে গৃহস্থ, ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষিতে বিদ্যুৎ যায়, তাদের মাশুল ব্যাপক বাড়বে।

ভরতুকি উঠে যাবে

বিদ্যুৎ বিলে বলা হয়েছে, যদি কোনও সরকার কোনও প্রকার গ্রাহকদের কিছু ভর্তুকিদিতে চায় তবে তা সরাসরি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দিতে হবে। এর অর্থ, আগে বিপুল হারে পাঠানো পুরো বিলটাই গ্রাহককে মেটাতে হবে। রান্নার গ্যাসের মতো আস্তে আস্তে সেই ভর্তুকি বাস্তবে উঠিয়ে দেওয়ার এটা একটি আইনি কৌশল। বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার লাইসেন্সবিহীন ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়োগের মাধ্যমে বন্টনজনিত সমস্যা (বিদ্যুৎ বিল, মিটার, লাইন মেরামত, ট্রান্সফরমার মেরামত ও প্রতিস্থাপন, নতুন লাইন নেওয়া, নিরাপত্তা ইত্যাদি) সমাধানে গ্রাহক হয়রানি ও অর্থ ব্যয় প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পাবে। এই বিলে ক্রস-বর্ডার ট্রেডের নামে বিদ্যুতে বৈদেশিক বাণিজ্যের (আমদানি-রপ্তানি) ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অর্থাৎ বেসরকারি মালিক যদি মনে করে বিদেশে বিদ্যুৎ রপ্তানি করলে লাভ বেশি হবে, তা হলে তাই করবে— দেশের মানুষ বিদ্যুৎ পাক বা না পাক।

ব্যবহারের আগেই বিল মেটাতে হবে

এই বিলে লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার গঠন, বিদ্যুৎ বন্টন লাইসেন্সির বদলে কেন্দ্রীয় সরকারের বশংবদ বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি করে সার্বিক কেন্দ্রীয়করণ করা এবং সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আইনি সহায়তা পাওয়া থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধুমাত্র রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠনে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সাথে মতামত বিনিময় করবে। বিদ্যুতের ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে বলা হয়েছে পেমেন্টের সিকিউরিটি গ্যারান্টি অবশ্যই থাকতে হবে। অর্থাৎ সাধারণ গ্রাহকদের প্রি-পেইড মিটার বাধ্যতামূলক করা হবে। এর পরিণাম ভয়ঙ্কর। প্রি-পেইড টাকা রাত ১২টায় শেষ হয়ে গেলে আপনা থেকেই বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যাবে প্রি-পেইড মোবাইলের মতো। আরও বিপজ্জনক দিক হল, প্রি-পেইড ব্যবস্থা চালু হলে মিটার রিডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা কাজ হারাবে এবং এই পোস্ট চিরতরে বিলোপ হবে, নিয়োগ বন্ধ হবে।

বেশি দামের বিদ্যুৎ বাধ্যতামূলক ভাবে কিনতে হবে

অপ্রচলিত বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট শতাংশ পরিমাণ বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য করার কথা বলা হয়েছে। এই বিদ্যুৎ বাস্তবে কর্পোরেট হাউস অস্বাভাবিক বেশি দামে বিক্রি করে। ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির আন্ডারে সাব ডিস্ট্রিবিউটারের কথা বলা হয়েছে। এই বিলে বলা হয়েছে কোনও একটি এলাকায় যেমন মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন অথবা পঞ্চায়েতে একাধিক কোম্পানি প্রতিযোগিতা করে বিদ্যুৎ বন্টনের ব্যবসা করতে পারবে, এবং বলা হচ্ছে, এতে নাকি দাম কমবে। এটা একটা লোকঠকানো মিথ্যাচার। একচেটিয়া ওষুধ কোম্পানিগুলো কি প্রতিযোগিতা করে দাম কমিয়েছে কখনও? একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে এই অবাস্তব কথা বাস্তবে একচেটিয়া পুঁজির হাতে সরকারি বন্টন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি তুলে দেওয়ার একটা কৌশল মাত্র।

কৌশলে জনবিরোধী বিলের প্রয়োগ চলছে

এই বিলের প্রয়োগ শুরু হয়েছে 'স্ট্যান্ডার্ড বিডিং ডকুমেন্ট' (এসবিডি) নামে। এই স্ট্যান্ডার্ড বিডিংয়ের কাজ হল, ১) রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চুক্তিবদ্ধ দামে ব্যক্তি শিল্পপতিদের কাছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সবটুকু সম্পদ বিক্রি করা। ২) বন্টন কোম্পানির জমি-বাড়ি ন্যূনতম ভাড়াতে ব্যক্তি মালিকানাধীনে দিয়ে দেওয়া। ৩) সমস্ত কর্মচারীদের, যাঁরা সরকারি চাকরি করেন তাদের ব্যক্তি মালিকানাধীন কর্মচারীতে পরিণত করা। যদিও ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যুৎ সেক্টরে টাটা, এসার, আদানি, গোয়েঙ্কা, টোরেন্ট ইত্যাদি কোম্পানি আছেই। এখন বিডিংয়ের নামে পুরো বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থাকে মাত্র কয়েকজন একচেটিয়া পুঁজিপতির কাছে হস্তান্তর করতে চাইছে সরকার। পুদুচেরি, জম্মু ও চণ্ডীগড় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সমগ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বন্টন ব্যবস্থাকে কর্পোরেটের কাছে বিক্রি করার নোটিশ ইতিমধ্যে জারি হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার পূর্বাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ নিগমকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা প্রবল আন্দোলনের ফলে আটকে দেওয়া হয়েছে।

সাতের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর পুরুলিয়া মফস্বল লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড ভগতু মাহাতো ৩০ সেপ্টেম্বর হাতুয়াড়া গ্রামে নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। কমরেড ভগতু মাহাতো আশির দশকে এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত স্পান পাইপ ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে বর্তমান পলিটবুরো সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষের সান্নিধ্যে দলের সাথে যুক্ত হন এবং তাঁর পরিবারকেও দলের সংস্পর্শে নিয়ে আসেন। তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে করতেই এলাকায় পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেন। পরবর্তীকালে ইউনিয়নের নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার ফলে আরও অনেকের সাথে তাঁকেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। কারখানার মালিকপক্ষ আন্দোলন না করার শর্তে রফা করতে চাইলেও ভগতু মাহাতো ও অন্যরা আপস করেননি। এর ফলে তাঁকে চরম আর্থিক দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তিনি আদর্শচ্যুত হননি বা দলের কাজ থেকে বিরত হননি। তিনি ছিলেন মিতভাষী, তাঁর আচার-ব্যবহারে ছিল উন্নত রুচি সংস্কৃতির স্পর্শ। তাঁর উপরে ন্যস্ত দলের কাজ তিনি সব সময় নিঃশব্দে করে গেছেন। তাঁর ঘরের দরজা কমরেডদের জন্য সব সময় খোলা থাকত। তাঁর মৃত্যুতে দল উন্নত রুচি-সংস্কৃতিসম্পন্ন একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারালো।

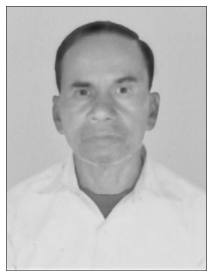

কমরেড ভগতু মাহাতো লাল সেলাম

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নদীয়া জেলার পলশুণ্ডা লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড আব্দুল আওয়াল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৮ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর।

কৈশোরেই পলশুণ্ডা হাইস্কুলে সপ্তম-অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময়েই মেধাবী ছাত্র কমরেড আওয়াল ৮২ সালে এ আই ডি এস ও-র সঙ্গে যুক্ত হন। কলেজে পড়ার সময়ে এ আই ডি এস ও-র জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তখন সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার নীতির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক ভাষা-শিক্ষা আন্দোলনে ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তেহট্ট থানা জুড়ে কমরেড আওয়ালের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা সংবলিত পুস্তক-পুস্তিকা তাঁর উপর গভীর প্রভাব ফেলে এবং ছাত্রাবস্থাতেই এলাকায় দলের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন।

কমরেড আওয়াল পেশাগত জীবনে ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক। শিক্ষকতা ও শারীরিক দুর্বলতার জন্য দলের দৈনন্দিন কাজে খুব বেশি সময় না দিতে পারলেও দলের প্রয়োজন অনুযায়ী মনীষী স্মরণ কমিটি, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা-সংহারকারী নীতির বিরুদ্ধে সেভ এডুকেশন কমিটি ও এলাকায় মদ ও মাদক দ্রব্য বিরোধী কমিটি গঠনে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রধান। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ-এর উদ্যোগে বৃত্তি পরীক্ষার দায়িত্ব পালনেও অন্যতম ভূমিকা নিতেন কমরেড আওয়াল।

অত্যন্ত নম্র, মিতভাষী কমরেড আওয়াল ছিলেন দলের কর্মী-সমর্থক-দরদি সহ গ্রামের সাধারণ মানুষের প্রিয়পাত্র। দলের সুখ-দুঃখের, সুসময়-দুঃসময়ের শরিক, একান্ত আপনজনের এই অকস্মাৎ মৃত্যু দলের পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং গুরুতর ক্ষতি।

কমরেড আব্দুল আওয়াল লাল সেলাম

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে কেন স্মরণ করব

প্রভাস ঘোষ

২০২০ সালের ২৮ নভেম্বর বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ সারা দেশের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে ইংরেজিতে একটি আলোচনা করেন যা অনলাইনে সম্প্রচারিত হয়। ৫ আগস্ট মহান এঙ্গেলসের ১২৬তম মৃত্যুদিবস উপলক্ষে সেই ইংরেজি আলোচনাটির বঙ্গানুবাদ ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রকাশ করছি। অনুবাদে কোনও ভুলত্রুটি থাকলে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের। এবার সপ্তম ও শেষ পর্ব।

— সম্পাদক, গণদাবী

(৭)

পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি

‘পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি’-র প্রথম সংস্করণের (১৮৮৪) ভূমিকায় এঙ্গেলস এই মূল্যবান বইটি মার্কসের উত্তরাধিকারের পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপিত করলেন। এই বইয়ে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে মানব সভ্যতার ইতিহাসের পর্যায়ক্রমিক স্তরের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা রয়েছে। আমি শুধু তার থেকে কিছু অংশ উল্লেখ করব।

“মর্গান তাঁর নিজের ধরনে আমেরিকায় একই বস্তুবাদী ধারণার পুনরাবিষ্কার করেন যা মার্কস ৪০ বছর আগেই আবিষ্কার করেছিলেন এবং বর্বরতা ও সভ্যতার তুলনামূলক বিচারে ওই ধারণা থেকে তিনি প্রধান প্রধান বিষয়ে মার্কসের মতো একই সিদ্ধান্তে পৌঁছান।”

“বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী শেষ বিচারে ইতিহাসের নির্ধারক উপাদান হচ্ছে প্রত্যক্ষ জীবনের উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন। কিন্তু এই ব্যাপারটির প্রকৃতি দ্বিবিধ। একদিকে জীবনযাত্রার উপকরণ— খাদ্য, পরিধেয় ও আশ্রয় এবং সেইজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উৎপাদন; অপর দিকে মানবজাতির জৈবিক উৎপাদন, বংশবৃদ্ধি।”

এখন আমি কিছু অংশ পড়ব যেখানে এঙ্গেলস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখিয়েছেন রাষ্ট্র সব সময় ছিল না। এর একটা শুরু এবং শেষ আছে। মানবসভ্যতার একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে যখন মানবসমাজ শ্রেণিবিভক্ত হয়েছিল, তখন এর উদ্ভব ঘটেছিল। যখন রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে এঙ্গেলস এই বইটি লেখেন, তখন তা শুধু সম্পূর্ণ নতুন কিছু ছিল তাই নয়, ছিল বিপ্লবাত্মক। তিনি বলেছিলেন—

“যেহেতু রাষ্ট্রের আবির্ভাব শ্রেণি-বিরোধকে সংযত করার প্রয়োজন থেকে এবং যেহেতু একই সঙ্গে তার উদ্ভব হয় শ্রেণি-বিরোধের মধ্যেই, সেজন্য রাষ্ট্র হল সাধারণত সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্বকারী শ্রেণির রাষ্ট্র, এই শ্রেণি রাষ্ট্রের মাধ্যমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও আধিপত্যকারী শ্রেণি হয়ে ওঠে এবং এ ভাবে নিপীড়িত শ্রেণির দমন-শোষণে নতুন হাতিয়ার লাভ করে। এইভাবে প্রাচীন রাষ্ট্র সর্বোপরি ছিল ক্রীতদাসদের দমনের জন্য দাস-মালিকদের রাষ্ট্র, যেমন সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস কৃষক ও ক্রীতদাসদের বশে রাখার জন্য অভিজাতদের সংস্থা এবং আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজি কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের হাতিয়ার।”

“অতএব চিরকাল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না। এমন সব সমাজ ছিল যারা রাষ্ট্র ছাড়াই চলত, যাদের রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কোনও ধারণাই ছিল না। অর্থনৈতিক বিকাশের একটা বিশেষ স্তরে যখন অনিবার্যভাবে সমাজে শ্রেণি-বিভাগ এল, তখন এই বিভাগের জন্যই রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। এখন আমরা দ্রুত গতিতে উৎপাদনের

বিকাশের এমন একটি স্তরে পৌঁছাচ্ছি, যখন এইসব বিভিন্ন শ্রেণির অস্তিত্ব আর শুধু যে অবশ্যপ্রয়োজনীয় থাকবে না তাই নয়, বরং তা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে উঠবে। আগেকার স্তরে যেমন অনিবার্যভাবে তাদের উদ্ভব হয়েছিল, তেমনি অনিবার্যভাবে তাদের পতন হবে। তাদের সাথে সাথে রাষ্ট্রেরও অনিবার্যভাবে পতন হবে। উৎপাদকদের স্বাধীন ও সমান যোগদানের ভিত্তিতে যে সমাজ উৎপাদন সংগঠিত করবে, সে সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে পাঠিয়ে দেবে তার যোগ্য স্থানে ঃ পুরাতত্ত্বের যাদুঘরে, চরকা ও ব্রোঞ্জের কুড়ুলের পাশে।”

প্রাচীন খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে

১৮৯৪ সালে এঙ্গেলস ‘প্রাচীন খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে’ নামে তাঁর বিখ্যাত বইটি লিখেছিলেন। এই বইয়ে তিনি ধর্ম ও সাম্যবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও উদ্দেশ্য এবং এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।

“ ... সূচনায় খ্রিস্টধর্ম ছিল নিপীড়িত মানুষের একটি আন্দোলন ঃ রোমের শাসকদের অধীনস্থ বা তাদের কারণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত দাস ও গরিব মানুষের ধর্ম হিসাবে প্রথম এর উদ্ভব হয়েছিল। খ্রিস্টধর্ম ও শ্রমিকদের সাম্যবাদ উভয়ই দাসত্ববন্ধন ও দুর্দশা থেকে ভবিষ্যতমুক্তির কথা প্রচার করে। খ্রিস্টধর্ম এই মুক্তির সন্ধান দেয় জীবনের শেষে মৃত্যুর পরে— স্বর্গে গিয়ে। আর সমাজতন্ত্র সমাজ পরিবর্তনের দ্বারা এই মাটিতেই তা স্থাপন করতে চায়। উভয়কেই নির্যাতন করা হয়, প্রলোভন দেখানো হয়, উভয়ের অনুগতদের ঘৃণার চোখে দেখা হয় এবং উভয়কেই বহিষ্কারক আইনের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়, প্রথমটিকে মানবজাতির শত্রু হিসাবে, পরেরটিকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসাবে, ধর্ম, পরিবার, সমাজ-শৃঙ্খলার শত্রু হিসাবে।” (মার্কস-এঙ্গেলস অন রিলিজিয়ন, ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ পাবলিশিং হাউস, মস্কো, ১৯৫৭)

কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার

এখন ১৮৪৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলসের যৌথভাবে লেখা ঐতিহাসিক পুস্তিকা ‘কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার’ থেকে আমি কিছু অংশ আপনাদের সামনে রাখব এটা দেখাতে যে আজও তা কতটা প্রাসঙ্গিক।

“মানুষের যেসব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসাবিদ, আইনবিশারদ, পুরোহিত, কবি, বিজ্ঞানী — সকলকেই এরা পরিণত করেছে তাদের মজুরি-ভোগী শ্রমজীবী রূপে।

পরিবারের ওপর থেকে সংবেদনশীল আবরণটি ছিঁড়ে ফেলে বুর্জোয়ারা পারিবারিক সম্পর্ককে পরিণত করেছে নিছক আর্থিক সম্পর্কে।”

“নিজেদের তৈরি করা পণ্যের জন্য নিরন্তর প্রসারিত হতে থাকা বাজারের তাগিদ বুর্জোয়া শ্রেণিকে সারা পৃথিবীময় দৌড় করিয়ে বেড়ায়। সর্বত্র তাদের বাসা বাঁধতে হয়, সর্বত্র গেড়ে বসতে হয়, যোগসূত্র স্থাপন করতে হয় সর্বত্র।”

“বিশ্ববাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণি প্রতিটি দেশের উৎপাদন ও ভোগকে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দিয়েছে।”

“আজকের দিনে বুর্জোয়াদের মুখোমুখি যেসব শ্রেণি দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে শুধু সর্বহারা শ্রেণিই হল প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণি। সর্বহারা শ্রেণি যার বিশেষ ও অপরিহার্য সৃষ্টি, সেই আধুনিক শিল্পের সামনে পড়ে অন্য শ্রেণিগুলিতে ক্ষয় ধরে এবং শেষপর্যন্ত সেগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়।”

“অতীতে সমস্ত ঐতিহাসিক আন্দোলন ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠদের আন্দোলন, কিংবা তাদের স্বার্থে আন্দোলন। সর্বহারা শ্রেণির আন্দোলন হল বিরাট সংখ্যাধিক্যের স্বার্থে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের আত্মসচেতন স্বাধীন আন্দোলন।”

“বুর্জোয়া সমাজে পুঁজি হল স্বাধীন এবং তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু জীবন্ত মানুষ হল অন্যের ওপর নির্ভরশীল এবং তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নেই।”

“আপনাদের ধারণাগুলি আপনাদের পুঁজিবাদী উৎপাদন ও পুঁজিবাদী মালিকানার শর্তগুলি থেকে উদ্ভূত, ঠিক যেমন আপনাদের আইনশাস্ত্র হল শুধুমাত্র আপনাদের শ্রেণি-ইচ্ছা যাকে সকলের জন্য আইন হিসাবে রূপ দেওয়া হয়েছে। এই ইচ্ছার মূল চরিত্র ও অভিমুখ নির্ধারিত হয় আপনাদের শ্রেণি-অস্তিত্বের অর্থনৈতিক শর্তগুলির দ্বারা।”

“মেহনতি মানুষের কোনও দেশ নেই। তাদের যা নেই তা আমরা কেড়ে নিতে পারি না। সর্বহারা শ্রেণিকে যেহেতু সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, জাতির নেতৃত্বকারী শ্রেণির পদে উঠতে হবে, নিজেকেই জাতি গঠন করতে হবে, তাই সেদিক থেকে সর্বহারা শ্রেণি নিজেই জাতীয়, যদিও কথাটার বুর্জোয়া অর্থে নয়।”

বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ, বাণিজ্যের স্বাধীনতা, জগৎজোড়া বাজার, উৎপাদন-পদ্ধতি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জীবনযাত্রার ধরনের অভিন্নতা— এই সবের জন্যই দেশে দেশে পার্থক্য ও মানুষে-মানুষে বিরোধ দিনের পর দিন ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে। সর্বহারা শ্রেণির মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্ত হল মিলিত প্রচেষ্টা, অন্তত অগ্রণী সভ্য দেশগুলির মিলিত প্রচেষ্টা।

মানুষের ওপর মানুষের শোষণ আনুপাতিক হারে যত বন্ধ করা যাবে, এক দেশের ওপর অন্য দেশের শোষণ তত বন্ধ করা যাবে। একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শ্রেণিগুলির মধ্যেকার বিরোধ আনুপাতিক হারে যত কমবে, এক রাষ্ট্রের অন্য রাষ্ট্রের ওপর শত্রুতার তেমনই অবসান হবে।”

“বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে লড়াইয়ের ভিতর অবস্থার চাপে যদি সর্বহারা শ্রেণি নিজেকে শ্রেণি হিসাবে সংগঠিত করতে বাধ্য হয়, বিপ্লবের মাধ্যমে তারা যদি নিজেদের শাসক শ্রেণিতে পরিণত করে ও শাসক শ্রেণি হিসাবে উৎপাদনের পুরাতন ব্যবস্থাকে যদি ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, তা হলে সেই পুরানো অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণিবিরোধের অস্তিত্বের শর্তগুলি তথা সব রকম শ্রেণির অস্তিত্বই ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে এবং তাতে করে শ্রেণি হিসাবে তার নিজের আধিপত্যেরও অবসান ঘটবে।”

“শ্রেণি ও শ্রেণিবিরোধ সংবলিত পুরানো বুর্জোয়া সমাজের জায়গায় আমরা পাব এক সমিতি, যেখানে সকলের স্বাধীন উন্নয়নের শর্ত হবে প্রত্যেকের স্বাধীন উন্নয়ন।”

“কমিউনিস্টরা মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে ঘৃণা বোধ করে। তারা খোলাখুলি ঘোষণা করে যে, চলতি সামাজিক পরিস্থিতিকে সবলে উচ্ছেদ করার দ্বারাই কেবলমাত্র তাদের লক্ষ্য সাধিত হতে পারে। কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক শ্রেণি কাঁপতে থাকুক। শৃঙ্খল ছাড়া প্রলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই। জয় করবার জন্য আছে সারা দুনিয়া।”

শ্রমিক শ্রেণির সমকালীন আন্দোলনগুলির দিক নির্দেশ করেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস

মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের সমকালীন শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনগুলির পথনির্দেশ দিয়েছিলেন। অনেক সময় নেবে বলে এই বিষয়টি আমি আলোচনায় আনিনি। সেই সময় ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন ও সংগ্রাম চলছিল। বেশিরভাগ লড়াইগুলিতেই বুর্জোয়া এবং পেটিবুর্জোয়ারা নেতৃত্ব দিত। কিন্তু

ছয়ের পাতায় দেখুন

আমতায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পরিচালনায় এবং স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সহযোগিতায় ৩১ অক্টোবর হাওড়ার আমতা ২ ব্লকের কাশমলি অঞ্চলে টাকিপাড়া প্রাইমারি স্কুলে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ১১৫ জন দুঃস্থ মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করে ওষুধ দেওয়া হয়।

ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের দাবি

ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে কলকাতা কর্পোরেশনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে এসইউসিআই (সি)-র উদ্যোগে সমস্ত বরোতে ১-৩ নভেম্বর ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ২ নভেম্বর দলের বড়িশা, সরশুনা, বেহালা পূর্ব ও বেহালা পশ্চিম লোকাল কমিটির উদ্যোগে কর্পোরেশনের ১৩ ও ১৪ নম্বরে বরো অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনের আগে ডায়মন্ড হারবার রোডে মিছিল ও কর্পোরেশনের গেটে বিক্ষোভ সভা করা হয়।

মূল্যবৃদ্ধি ও ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আসাম জুড়ে আন্দোলন

লখিমপুর

অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ ও বাস-ট্রেভেলার সহ সব ধরনের যাত্রীবাহী গাড়ির ভাড়া হ্রাস করার দাবিতে ২ নভেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) আসাম রাজ্য কমিটির ডাকে রাজ্যের সর্বত্র বিক্ষোভ দেখানো হয়। দলের কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শিলচরের জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জেলা সম্পাদক ভবতোষ চক্রবর্তী, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক শ্যামদেও কুর্মী ও মাধব ঘোষ বক্তব্য রাখেন। ভবতোষ চক্রবর্তী বলেন, সুলভ মূল্যের দোকান মারফত অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহের যে ব্যবস্থা ছিল তা বিজেপি সরকার তুলে দেওয়ায় সাধারণ মানুষের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে পড়েছে। মূল্যবৃদ্ধি রোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতায় বসে বিজেপি সরকার একদিকে পেট্রল-ডিজেল সহ বিভিন্ন সামগ্রীর উপর অত্যধিক কর আরোপ করেছে অন্য দিকে পুঁজিপতিদের উচ্চহারে মুনাফার সুযোগ করে দিচ্ছে।

গোয়ালপাড়া

এই পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষদের সুরক্ষা প্রদানে সরকারি গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে সুলভ মূল্যের দোকান মারফত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ অত্যন্ত জরুরি। মূল্যবৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের খুচরো এবং পাইকারি উভয় ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু জরুরি। একটি দাবিপত্র মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে জেলাশাসক মারফত দেওয়া হয়। গুয়াহাটিতে শতাধিক কর্মী মিছিল করে জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকপত্র দেন।

কমসোমলের শিক্ষাশিবির

কিশোর সংগঠন কমসোমলের কাঁথি ইউনিটের পক্ষ থেকে ৩০ অক্টোবর কাঁথি শহরে শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। কমসোমলের অন্যতম জেলা ইনচার্জ কমরেড সুদর্শন মান্না উপস্থিত ছিলেন। দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ-এর 'কিশোরদের প্রতি' বইটি থেকে ওঠা নানা প্রশ্নের ভিত্তিতে কিশোর-কিশোরীরা প্রথমে আলোচনা করেন। মূল আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি) জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মানস প্রধান।

ধর্ষকদের শাস্তির দাবি বর্ধমানে

১২ অক্টোবর, বর্ধমান শহরের পারাপুকুর এলাকাতে এক গৃহবধূকে গণধর্ষণ করার প্রতিবাদে ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এআইডিএসও, এআইএমএসএস ও এআইডিওয়াইও-র পক্ষ থেকে বর্ধমান থানায় ডেপুটেশন ও কার্জন গেটে বিক্ষোভ হয়।

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির সভা

রোকেয়া নারী উন্নয়ন সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১০ অক্টোবর বহরমপুর রোকেয়া ভবনে। ১৫টি ব্লকের নির্যাতিতা নারীরা ছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলার বহু বিদ্বজ্জন উপস্থিত ছিলেন। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা কাবেরী বিশ্বাসকে সভাপতি, খাদিজা বানুকে সম্পাদক, কার্যকরী সভাপতি হিসাবে ডাঃ এ হাসান, সোমনাথ চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা স্মৃতিরেখা রায় চৌধুরী সহ অন্যান্যদের নিয়ে ৮২ জনের কমিটি গঠিত হয়। সবশেষে অধ্যাপিকা সুজাতা দে বসুর স্মরণে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

সব কা সাথ, 'কুছ' কা বিকাশ

বিজেপি সরকারের নির্বাচনী স্লোগান ছিল 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ।' কিন্তু ধনী-দরিদ্রে আর্থিক বৈষম্য যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে এই স্লোগান দিতে এখন বিজেপি নেতাদেরই ঢোক গিলতে হচ্ছে। তারা ভুলেও তা উচ্চারণ করছেন না।

একদিকে একচেটিয়া পুঁজি-মালিকদের সম্পদ অস্বাভাবিক হারে ফেঁপে উঠছে। অন্য দিকে দরিদ্র, নিম্নবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক, যাঁরা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা প্রতিদিন পরিণত হচ্ছেন হতদরিদ্রে। তাহলে দেশের কোটি কোটি শ্রমিক-কৃষক মেহনতি মানুষ কঠোর পরিশ্রমে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ তৈরি করছে, তা যাচ্ছে কোথায়?

সম্প্রতি আইআইএফএল ওয়েলথ হুরুন ইন্ডিয়ার প্রকাশিত, ২০২১-এর ধনীদের তালিকায় আদানিরা এখন ভারত তথা এশিয়ারও দ্বিতীয় ধনীতম পরিবার। করোনার আবহেই গত এক বছরে শিল্পপতি গৌতম আদানি এবং তাঁর পরিবারের প্রতিদিনের আয় ১০০২ কোটি টাকা। সম্পত্তি ১,৪০,২০০ কোটি টাকা থেকে এক লাফে ২৬১ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৫,০৫,৯০০ কোটি টাকা। করোনা অতিমারির আগে দেশে ১০০ কোটি টাকার উপর সম্পদের মালিক ছিল ৫৮ জন, কিন্তু অতিমারিতেই সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৩ জন। অর্থাৎ বিপুল সম্পদ কুক্ষিগত হচ্ছে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের হাতে।

প্রশ্ন হল, দেশে এমন কোন ব্যবসা রয়েছে যেখানে ২৬১ শতাংশ মুনাফা হয়? আইনসম্মত যে কোনও ব্যবসায় ২০ শতাংশ মুনাফা হলেই তার পরিমাণ বিপুল বলে ধরা হয়। তা হলে আদানিদের এই বিপুল মুনাফা কি আইনি পথে নয়? অর্থাৎ তার সবটাই বেআইনি? অবশ্য এমন সন্দেহের গুরুতর কারণ রয়েছে। প্রথমত, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নীতির ফলে, যা কংগ্রেস সরকারের আমল থেকেই চলে আসছে, তাতে দেশের একচেটিয়া পুঁজির মালিকরা অবিশ্বাস্য হারে মুনাফা করে চলেছে। এই নীতির ফল হিসাবেই দেশের ৭৩ শতাংশ সম্পদের মালিকানা কুক্ষিগত হয়েছে মাত্র ১ শতাংশের হাতে। করোনা অতিমারির মধ্যেও বিজেপি সরকার মালিকদের জন্য ঢালাও আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করছে, বকেয়া কর মকুব করে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে চলেছে। দ্বিতীয়ত, বিজেপি সরকারের সঙ্গে আদানিদের ঘনিষ্ঠতা কারও অজানা নয়। গুজরাটে শূন্য থেকে আদানিদের উত্থান নরেন্দ্র মোদির মুখ্যমন্ত্রীর সময় থেকে। তারপর মোদিজিরও যেমন হাউই গতিতে উত্থান হয়েছে আদানিদের উত্থানও তেমনই একই গতিতে হয়েছে। ফলে আম্বানিদের মতো আদানিরাও যেমন বিজেপির পিছনে টাকা ঢেলেছে তেমনই প্রথমে গুজরাট সরকার, পরে ভারত সরকারও আইনি-বেআইনি সমস্ত পথেই আদানিদের ঢালাও লুটের সুযোগ করে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় পরিবেশবিদদের সমস্ত আপত্তিকে উড়িয়ে দিয়ে আদানি যে কয়লাখনি কিনেছে তার খরচ মেটাতে প্রধানমন্ত্রী স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানকে সেখানে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ ৬ হাজার কোটি টাকার নামমাত্র সুদে খনি বরাদ্দ করে দিয়েছে। সেই কয়লা এ দেশে রপ্তানি করে লুট চালানোর জন্য কয়লার সঙ্কটের গল্প ফলাও করে প্রচার চলছে। বিজেপি সরকারি সম্পত্তি জলের দামে আদানিদের হাতে তুলে দিয়েছে। তাদের মুনাফার জন্য পুরনো আইন বদলে দিয়েছে, নতুন আইন তৈরি করেছে। বিজেপি সরকারের আনা নতুন কৃষি আইন পাশের অনেক আগেই কৃষিপণ্যের ব্যবসায় বিপুল অঙ্কের টাকা ঢেলে বসে আছে আদানি গোষ্ঠী। এর থেকে পরিষ্কার এই আইন আম্বানি আর আদানিদের জন্যই। অর্থাৎ আদানিদের এই বিপুল মুনাফা একেবারেই আইনি পথে নয়, সরকারের সাথে যোগসাজশে দেশের জনগণকে ফাঁকি দেওয়ার, প্রতারণা করার ফল।

সম্প্রতি গুজরাটের মুন্দ্রা বন্দরে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকার হেরোইন ধরা পড়েছে। এই হেরোইন নাকি আফগানিস্তান থেকে ইরান হয়ে মুন্দ্রা বন্দরে এসেছে। প্রশ্ন হল, এই হেরোইন আমদানিতে বন্দর মালিক আদানিদের ভূমিকা কী? তদন্তের স্বার্থে আদানিদের গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল না কেন? এই মাদক তো সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে যুবসমাজকে আসক্ত করত। এর আগেও এ ভাবে মাদক এসেছে কি না, এলে কতবার এসেছে, তাতে বন্দর কর্তৃপক্ষের ভূমিকা কী, এগুলি নিয়ে অবিলম্বে তদন্ত করার দায়িত্ব কি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নয়? কেন তদন্ত করা হচ্ছে না? এই পথেই কি তা হলে আদানিদের এই ২৬১ শতাংশ মুনাফা এসেছে? এই সব প্রশ্নের উত্তর দেশবাসীকে জানানো কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। সরকার তা জানাবে কি না সন্দেহ। কিন্তু মোদ্দা কথাটা হল বিজেপি সরকারের 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ, বাস্তবে 'কুছ কা বিকাশ', একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বিকাশ।

তেলের বিপুল দামবৃদ্ধির পর নামমাত্র কমিয়ে প্রতারণাই করল সরকার

প্রবল গণঅসন্তোষের সামনে পড়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পেট্রল এবং ডিজেলের উপর চাপানো চড়া হারের উৎপাদন শুল্ক সামান্য একটু কমিয়েছে। তাতেই বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা দীপাবলির উপহার বলে একেবারে দু'হাত তুলে শোরগোল শুরু করেছেন। সরকার দাম কমিয়েছে পেট্রলে ৫ টাকা আর ডিজেলে ১০ টাকা। এর ফলে রাজ্য ভ্যাট কিছুটা কমবে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে পেট্রলে ৭ টাকা এবং ডিজেলে ১১ টাকার মতো করে কমছে। অথচ বিজেপি কেন্দ্রীয় গদি দখলের পর পেট্রলে উৎপাদন শুল্ক বাড়িয়েছে ২৩ টাকার বেশি, ডিজেলে প্রায় সাড়ে ২৮ টাকা। এখন সামনে উত্তরপ্রদেশ সহ কয়েকটা রাজ্যের ভোট থাকায় জনমতকে বিভ্রান্ত করতে আপাতত তেলের কিছুটা দাম কমানোর কথা বললেও গ্যাসের হাজার টাকায় তারা হাত দেয়নি।

এ কথা সবাই জানেন যে বর্তমানে পেট্রলের ১০৬ টাকা দরে দামের অংশ মাত্র ৪৪ টাকা। বাকিটা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কর। কেন্দ্রীয় করই বেশি। এখন রাজ্যগুলোও কর কমাক, এই আওয়াজ বিজেপি তুলছে। অবশ্যই রাজ্য সরকারকে কর কমাতে হবে। কিন্তু কেন্দ্র কি যা করতে পারত তার পুরোটা করল? আদৌ না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আরও কয়েকবার দাম বাড়ানোর জন্য তেল কোম্পানিগুলো মুখিয়ে আছে। সরকার কি তা আটকাবে? তেল কোম্পানিগুলির দাবি মেনে পেট্রল এবং ডিজেলের দামে সব নিয়ন্ত্রণই তারা তুলে নিয়েছে। বিনিয়ন্ত্রণের শুরুটা অবশ্য কংগ্রেস করে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সবটাই লাগামছাড়া।

২০২০ সালের এপ্রিলে যখন অপরিশোধিত তেলের দাম ১৬ ডলারের নিচে নেমে গিয়েছিল সেই সময় ভারতে যাতে দাম অনেকটা না কমে তা নিশ্চিত করতে পেট্রলে ১০ টাকা এবং ডিজেলে ১৩ টাকা শুল্ক বাড়িয়েছিল কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। এমনকি বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কার্যত শূন্যের নিচে নেমে যাওয়ার সময়েও দেশবাসীকে কম দামের সুবিধা দেওয়া দূরে থাক, তেল কোম্পানিগুলির বিপুল লাভ এবং সরকারি করের ভাগ বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের উপর দামের বোঝা তারা ক্রমাগত বাড়িয়েছে।

লক্ষণীয়, এবার দাম কমানোর সময় কেন্দ্রীয় সরকার সেস কমায়নি, কমিয়েছে এক্সাইজ ডিউটি। কারণ এক্সাইজের ভাগ পায় রাজ্যগুলি, সেসের ভাগ দিতে হয় না। ফলে রাজ্যকে দেয় টাকার পরিমাণ কমলেও কেন্দ্রীয় লাভে হাত পড়বে না। যদিও তেলে কেন্দ্রীয় করের বড় অংশই চেপে আছে সেস হিসাবে। রাস্তা ও পরিকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি নানা নামের সেস কেন্দ্রীয় সরকার তেলের উপর চাপিয়ে রেখেছে। যে নামেই সেস চাপানো হোক না কেন, তা কি জনগণের উপকারে খরচ হয়েছে? একেবারেই না। বিজেপি সরকার এই তহবিলকে কাজে লাগিয়েছে একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের কর মকুব করার কাজে। গত বছর তেল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার আয় করেছিল ৩.৩৪ লক্ষ কোটি টাকা। এ বছরের লক্ষ্য ছিল ৪ লক্ষ কোটি টাকা। তার মাত্র ৪৫ হাজার কোটি সরকার ছেড়ে দিচ্ছে। এই আয়ের বড় অংশ গেছে করোনা কালে কর্পোরেট কর মকুব, বাড়তি ঋণ দিয়ে একচেটিয়া মালিকদের পুঁজি জোগানো ইত্যাদি কাজে।

তেলের চড়া দামের ফলে সাধারণ মানুষ মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার হয়েছে। ছোট পুঁজির ব্যবসা, কৃষকের নাভিশ্বাস উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণে বোঝা যায়নি যে তাদের এ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা আছে। বরং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা একাধিকবার বলেছেন এমন কিছু দাম বাড়েনি যে চিন্তিত হতে হবে। কেন্দ্রের এক মন্ত্রী বলেছেন, তেলের বাড়তি শুল্ক থেকে বিজেপি সরকার বিনা মূল্যে টিকা দিচ্ছে। তাহলে পিএম কেয়ার্সের টাকাগুলো কোন কাজে অদৃশ্য হয়ে গেল সে প্রশ্নের উত্তর তাঁরা দিচ্ছে না কেন?

সাধারণ মানুষের ঘাড় ভেঙে সরকারের সাথেই মুনাফার পাহাড় বানাচ্ছে তেল কোম্পানিগুলি। রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি ইন্ডিয়ান অয়েল গত বছর মুনাফা করেছে ২১ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা। আম্বানিদের রিলায়েন্স মুনাফা করেছে ৩১ হাজার ৯৪৪ কোটি টাকা। তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানির মোট মুনাফা ৫০ হাজার কোটির বেশি। যা বিগত কয়েক বছরের বাৎসরিক মুনাফার কয়েক গুণ বেশি। অথচ দেশে করোনা মহামারিতে তেলের চাহিদা কমেছে ৯.১ শতাংশ। অর্থাৎ কম তেল বেচেও অনেক বেশি মুনাফা করেছে সরকারি বেসরকারি কোম্পানিগুলি। এর জোরে রিলায়েন্স সৌদি আরবের অ্যারামকোর সাথে গাঁটছড়া বেঁধে বিশ্ব বাজারে বড় শক্তি হয়ে উঠছে। আদানি কিংবা এসারের মতো কোম্পানিও বেশি বেশি করে ভারতের তেল বাজারে ভাল ব্যবসা জমিয়েছে। ভারত পেট্রলিয়ামকে এই সব ধনকুবেরদের হাতেই বেচে দিতে চাইছে সরকার। এই বিপুল মুনাফার ফাঁদে পড়ে জনসাধারণের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসছে। তাই এই সামান্য দাম কমানো, কিংবা রাজ্যগুলোর ভ্যাট কমানো প্রধান বিষয় নয়। আজ প্রধান প্রয়োজন তেল, গ্যাসের মতো জনজীবনের অত্যাবশ্যক পণ্যগুলিকে মুনাফার কবল থেকে মুক্ত করে জনমুখী রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য হিসাবে দেখা, প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে জনসাধারণের কাছে সস্তায় তা পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু তেল কোম্পানির বিপুল লাভ আর বাড়তি কর আদায়ের লোভে এ কাজ পুঁজিপতিদের সেবাদাস সরকার করবে না। করতে হলে জনমত সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তুলে তার চাপে তাকে বাধ্য করতে হবে।

বিজেপির সাম্প্রদায়িক আক্রমণ থেকে রেহাই পেলেন না নামী ক্রিকেটাররাও

সম্প্রতি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের কাছে ভারতীয় দলের হারের পর, দলের ক্রিকেটার মহম্মদ শামিকে উদ্দেশ্য করে বিজেপির আইটি সেল সমাজমাধ্যমে কুরুচিপূর্ণ প্রচার চালিয়েছে। এই ঘটনা এ দেশের ক্রীড়াপ্রেমী সহ আপামর সাধারণ মানুষকে বিস্মিত এবং ব্যথিত করেছে।

হার-জিত খেলারই অঙ্গ। পৃথিবীতে কোনও খেলোয়াড় বা কোনও দলই চিরদিন অপরাজেয় থাকে না। দেশপ্রেমের আবেগকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ সব সময়ই চায় নিজের দেশ জিতুক। নিজের দেশের দল পরাজিত হলে তারা ব্যথা পায়। কখনও কখনও সেই ব্যথা ক্ষোভের আকারে প্রকাশিত হতে পারে। কিন্তু এবারের এই কুৎসা প্রচারের অভিমুখ এবং ধরন সম্পূর্ণ অন্য। ভারতীয় ক্রিকেট দল পরাজিত হতেই মহম্মদ শামির ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে যেভাবে কুৎসা এবং সংখ্যালঘুদের দেশপ্রেম নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে তা পুরোটাই পরিকল্পিত। আরএসএসের মতাদর্শে পরিচালিত বিজেপি সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রকেই হিন্দুত্বের বাতাবরণের মধ্যে আনতে চাইছে। পুঁজিপতি শ্রেণির নির্লজ্জ শোষণে দেশের চরম দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছে শাসকরা। বিশেষত সামনে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে নিজেদের অপশাসনের নজিরগুলি ঢাকতে ধর্মীয় মেরুকরণের জিগির তুলতে চাইছে তারা। তাই এই আক্রমণ।

এদেশের ক্রীড়া প্রশাসনেও বিজেপি বারবার হস্তক্ষেপ করে ক্রীড়া সংস্থাগুলোর ব্যাপক দলীয়করণ করে চলেছে। একচেটিয়া পুঁজির একনিষ্ঠ সেবা করতে দেশের সাধারণ মানুষের ওপর কর, মূল্যবৃদ্ধি সহ ব্যাপক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার। এতে মানুষের ক্ষোভ যাতে সংগঠিত প্রতিবাদের আকার না নিতে পারে, সেই জন্য তাদের উগ্র ধর্মীয় বিভাজনের মধ্যে ফাঁসিয়ে দিতে এবারে তারা ক্রীড়াক্ষেত্রকে বেছে নিয়েছে। সেই কারণেই মহম্মদ শামির উপর এই ঘৃণ্য আক্রমণ। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কিন্তু একটা শব্দও এর বিরুদ্ধে উচ্চারণ পর্যন্ত করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারও চোখ বুজে থেকেছে। অথচ একটি গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব হল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুত্র এখন ক্রিকেট বোর্ডের সচিব। যে ক্রিকেটারদের স্বার্থ দেখার জন্য বোর্ড, তাদের পাশে দাঁড়ানোর বদলে বাবার রাজনৈতিক স্বার্থই তাঁর কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল কি? যদিও আমরা আশাবাদী এই দেখে যে, ভারতীয় ক্রিকেট দলের একাংশ বিশেষ করে দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি সরাসরি বিবৃতি দিয়ে এই ঘটনার নিন্দা করে বলেছেন, ধর্ম প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয়। খেলার মাঠে প্রত্যেকে ভারতীয় হিসেবে খেলতে নামেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, তাঁরা মহম্মদ শামির পাশে আছেন। দেশের বেশিরভাগ মানুষের মতও এটাই।

অতীতে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি দায়বদ্ধতা দেখিয়েছেন যে সমস্ত ক্রিকেটাররা, তাঁদের অনেকেই ধর্ম পরিচয় অনুযায়ী সংখ্যালঘু। কিন্তু তাঁদের সকলেরই ক্রীড়া নৈপুণ্য ক্রিকেটপ্রেমী জনগণকে মুগ্ধ করেছে। মনসুর আলি খান পতৌদি বা মহম্মদ আজহারউদ্দিন, জাহির খান সহ আরও অনেকেই ভারতীয় ক্রিকেট দলকে বহু স্মরণীয় জয় উপহার দিয়েছেন। এমনকি মহম্মদ শামিও অতীতে বহুবার তাঁর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু নিজেদের নোংরা কায়েমি স্বার্থে বিজেপি-আরএসএস আজ খেলাকেও ধর্মের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চায়। খেলার মাঠে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার যে ঐতিহ্য রয়েছে তাকে তারা মুছে ফেলতে চায়। এর বিরুদ্ধে গোটা দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সোচ্চার হতে হবে।

কৃষক বিক্ষোভ বাদুড়িয়ায়

একের পাতার পর

কেন এমন হল? প্রাকৃতিক বিপর্যয়? না। চাষিদের বক্তব্য বন্ধ্যা বীজ। স্থানীয় চারা ব্যবসায়ীদের চারা ও খোলাপোতা বাজারের বীজ ব্যবসায়ীদের থেকে নেওয়া বীজ এজন্য দায়ী। এই বিপর্যয়ে ক্ষোভে চাষিরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন কপি খেতে। চড়া সুদে ব্যাঙ্ক-সমবায়-বন্ধন ব্যাঙ্ক-স্থানীয় মহাজনের কাছ থেকে প্রচুর টাকা ঋণ করেছেন তাঁরা। কড়া তাগাদা তাদের। সেই ঋণ শোধ হবে কী করে! পরের দফার চাষের খরচ আসবে কোথা থেকে— এই ভাবনায় দিশাহীন চাষিরা। খবর পেয়ে ছুটে যান সেখানে অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের জেলা সম্পাদক দাউদ গাজি। শুরু হয় চাষিদের নিয়ে আন্দোলন। ফুলকপিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। চাষিরা পোড়া ফুলকপি গাছ হাতে নিয়ে বাদুড়িয়া শহরে মিছিল করে চৌমাথা অবরোধ করেন। এরপর বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কৃষি দপ্তরের ভিতরে ঢুকে যান চাষিরা এবং স্মারকলিপি জমা দেন। তাঁদের দাবি— ক) ফসলের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, খ) ঋণমকুব করতে হবে, গ) আগামী ফসল তৈরির উপকরণ ও অনুদান দিতে হবে। কৃষি আধিকারিক এডিএ ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন। বিডিও অফিসেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

মহান ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে কেন স্মরণ করব

তিনের পাতার পর

শ্রমিক এবং কৃষকরাও এই সংগ্রামগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল। শ্রমিক-কৃষকরা যাতে সেগুলিতে স্বাধীন ভূমিকা পালন করে, সে বিষয়ে তাদের পথ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। ওই সংগ্রামগুলিতে মার্কস ও এঙ্গেলস সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন। পিয়েরি জোসেফ প্রুধোঁ এবং লুই অগস্ট ব্লাঙ্কির মতো পেটিবুর্জোয়া নৈরাজ্যবাদীদের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ায় মার্কস ও এঙ্গেলস প্যারি কমিউনে নেতৃত্ব দিতে পারেননি। ১৮৬৪ সালে লন্ডনে গঠিত হয়েছিল প্রথম আন্তর্জাতিক। এতে বাকুনিন এবং লাসালে বিভেদপন্থা নিয়ে কাজ করতেন এবং ১৮৭৬ সালে তা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৮৯ সালে যখন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত হয়, সমাপ্তি অধিবেশনে এঙ্গেলসকে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করা হয়েছিল। বিপুল উদ্দীপনায় তাঁকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেছিলেন, "এই অভিনন্দন আমার জন্য নয়। এই অভিনন্দন, এখানে যাঁর ছবি রয়েছে তাঁর, অর্থাৎ মার্কসের জন্য।"

আট ঘন্টার কর্মদিবস-এর দাবিতে এঙ্গেলসের উদ্যোগেই ১৮৮৯ সালে ১ মে দিনটি 'শ্রমিক দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৯০ সালে প্রথম 'মে দিবস' পালন উপলক্ষে লন্ডনের বিশাল সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছিলেন এঙ্গেলস এবং গভীর বেদনা নিয়ে সেখানে বলেছিলেন, "আজ যদি মার্কস আমার পাশে থেকে স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখতে পেতেন!" মহান মার্কসের অবর্তমানে কী গভীর বেদনাই না তিনি বহন করতেন!

মার্কসবাদী তত্ত্ব আপ্তবাক্য নয়, বরং তা একটি বিকাশশীল বিজ্ঞান

এবার আমি প্রশ্ন করি, এই ধরনের সভা এবং আমার এই আলোচনার উদ্দেশ্য কী? এটা কি নিছক একটা আনুষ্ঠানিকতা? নাকি এ আমাদের পণ্ডিতমন্যতার পরিতৃপ্তির জন্য? নিশ্চয়ই তা নয়। আমাদের দুই মহান শিক্ষকের একজনকে আমরা স্মরণ করছি তাঁর কাছ থেকে জানতে এবং শিখতে। মার্কসবাদের শিক্ষা যাকে পর্যায়ক্রমে মহান লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ এবং পরবর্তীকালে কমরেড শিবদাস ঘোষ বিজ্ঞান হিসাবে আরও বিকশিত করেছেন, আমাদের কর্তব্য হল, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। লেনিন যেমন বলেছেন,

"মার্কসবাদী তত্ত্বকে আমরা সমাপ্তি ঘটে যাওয়া কোনও অলঙ্ঘনীয় বিষয় বলে মনে করি না, বরং আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝি যে এটি বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে, জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাইলে সমাজতন্ত্রীদের যেটিকে সমস্ত দিক থেকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।" (সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যুম ১১)

আজ আমরা এমন একটি সময়ে এঙ্গেলসের স্মরণ দিবস উদযাপন করছি, যেখানে একদিকে সারা বিশ্বজুড়ে একটার পর একটা আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সাধারণ মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ বিক্ষিপ্ত সংগ্রামের আকারে ফেটে পড়ছে। কিন্তু সেগুলিকে সঠিক পথে পরিচালনা করার মতো কোনও নেতৃত্ব নেই, কোনও আদর্শ নেই, কোনও সংস্কৃতি নেই, কোনও সংগঠন নেই। একটার পর একটা আন্দোলনের ঢেউ উঠছে, স্তিমিত হয়ে পড়ছে; আবার উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

এ ক্ষেত্রেও আমি একটা অন্য বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এক সময় লেনিন বলেছিলেন,

"এ ছাড়াও, বেশ কিছু রাষ্ট্র ... পশ্চিমের পুরানো রাষ্ট্রগুলি, তাদের বিজয়ের কারণে ... তাদের দেশের নিপীড়িত শ্রেণিগুলিকে অল্প-স্বল্প সুযোগ সুবিধা দিতে পেরেছে, যে কারণে সেই দেশগুলোতে বিপ্লবী আন্দোলনগুলো মন্থর করে দিতে পারছে এবং সাময়িক 'সামাজিক শান্তি' বজায় রাখতে পারছে ... অন্যদিকে ... প্রাচ্য দেশগুলি নিশ্চিতভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে আসছে, নিশ্চিতভাবে তাদের বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের সাধারণ সংগ্রামের ঘূর্ণাবর্তে টেনে আনা হচ্ছে।"

কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে, এ দেশ ও অন্য দেশের মধ্যে এমন পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না। এমনকি সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলোতে, আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলোর মতো সাম্রাজ্যবাদী দেশে, এমনকি আধুনিক রাশিয়া এবং চিন— যারা প্রতিবিপ্লবের পর সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয়েছে, সর্বত্রই প্রবল সঙ্কট ও অসন্তোষ ফেটে পড়ছে। স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত অগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া দেশেই বাস্তব পরিস্থিতি বিপ্লবের জন্য তৈরি, কিন্তু দুঃখজনকভাবে বিপ্লবের প্রস্তুতি অনুপস্থিত।

সকল দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষেরা সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন

মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষাকে হাতিয়ার করে লেনিনই সর্বপ্রথম রাশিয়ার মাটিতে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লব সফল করেছিলেন। লেনিন এবং তারপর স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রাশিয়া একটা নতুন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, যাকে শুধু বিশ্বের সমগ্র শ্রমিক শ্রেণিই নয়, বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রমাঁ রল্যাঁ, বার্নাড শ, আইনস্টাইনের মতো মহান মানুষ এবং আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুব্রমণ্য ভারতী, নজরুল, প্রেমচন্দ, সুভাষচন্দ্র বোস, ভগৎ সিং এবং আরও অনেকেই সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এটা ছিল একটা নতুন সভ্যতা, একটা নতুন সমাজ— যেখানে কোনও ছাঁটাই ছিল না, অর্থনৈতিক সংকট ছিল না, বেকারত্ব ছিল না। প্রত্যেকের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিত ছিল। মানুষের উপর মানুষের শোষণ ছিল না। ছিল নারী ও পুরুষের সমানাধিকার। শিক্ষা ও চিকিৎসা পাওয়া যেত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা ছিল না। ভিক্ষাবৃত্তি ছিল না, পতিতাবৃত্তি ছিল না। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, জনজাতিগত কোনও সংঘর্ষ এখানে ছিল না। এসব সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ একে 'তীর্থস্থান' বলে অভিহিত করেছিলেন। ১৯৪১ সালে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি আশা করি, এই বিপ্লব সফল হবে।" ৮০তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার ভয়াবহ সংকট দেখে গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করেছিলেন। কোন সভাতার সংকট? এই পুঁজিবাদী সভ্যতার সংকট!

মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুঙ-শিবদাস ঘোষ— সকল চিন্তানায়কই সমাজতন্ত্রের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। এটা খুবই দুঃখের যে, সমাজতন্ত্র, যা মানুষের সামনে একটা নতুন আশা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, তা আজ আর নেই— প্রতিবিপ্লবের আঘাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কেন এমন ঘটল?

আমি এ বিষয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্য উল্লেখ করতে চাই। যখন বিশ্বাসঘাতক ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করলেন, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়া তাকে সাদরে স্বাগত জানাল। ঠিক এই সময়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ সতর্ক করে বলেছিলেন, "স্ট্যালিনকে খাটো করার অর্থ লেনিনবাদকেই খাটো করা এবং এর দ্বারা সংশোধনবাদ ও প্রতিবিপ্লবের দরজা খুলে দেওয়া হবে।" শেষ পর্যন্ত আমাদের সামনে সেই দুঃখজনক ঘটনাই সংঘটিত হল।

প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে রাশিয়া কী পেল?

আবার সেখানে বেকারত্ব, ছাঁটাই, ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি ফিরে এসেছে এবং রাশিয়া একটা স্বৈরতান্ত্রিক দেশে, সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয়েছে। চিনে এখন কী ঘটছে? চিন পুরোপুরি একটা সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বের মধ্যে চিনা পণ্য সবচেয়ে সস্তা কেন? কারণ, চিনা শ্রমিকরা এখন সবচেয়ে বেশি শোষিত হচ্ছে। জনগণের কোনও গণতান্ত্রিক অধিকারই সেখানে নেই। চিনে কায়েম রয়েছে একটা ফ্যাসিস্ট শাসন ব্যবস্থা।

রাশিয়ায় প্রতিবিপ্লবের পর পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গোটা বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন হয়েছে। এই আন্দোলন এখন প্রায় সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ। প্রকৃত মার্কসবাদীরা বার বার পরাজয়ের সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু কখনই তারা হতাশ হয় না। দ্বান্দ্বিক বিজ্ঞান প্রয়োগ করে তারা পরাজয়ের কারণগুলি খুঁজে বের করে, তা থেকে উপযুক্ত শিক্ষা নেয় এবং তারপর বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। এটা এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, বিভিন্ন ধর্মের পূর্ণ বিজয়ের জন্য শত শত বছরের সংগ্রাম প্রয়োজন হয়েছিল।

সেই সংগ্রামগুলিকেও বার বার পরাজিত হতে হয়েছিল। এই সংগ্রামগুলো ঈশ্বরের নির্দেশ কার্যকর করার দাবি করত। আবার, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য সময় লেগেছিল ৩৫০ বছর। এ সবই ছিল এক ধরনের শ্রেণি শোষণের বদলে আর এক ধরনের শ্রেণি শোষণ প্রতিষ্ঠা করার লড়াই। কিন্তু রাশিয়া এবং চিনের বিপ্লব ছিল সমস্ত ধরনের শ্রেণি শোষণ— যা ইতিহাসে কয়েক হাজার বছর ধরে আধিপত্য করেছে, তার অবসান ঘটানোর বিপ্লব। ফলে এ ছিল হাজার হাজার বছরের শ্রেণি শোষণের ইতিহাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। মনে রাখবেন, ৭০ বছরের সমাজতন্ত্রকে লড়তে হয়েছিল কয়েক হাজার বছরের পুরনো শ্রেণি শোষণের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কী সুমহান ছিল এই সংগ্রাম!

তাছাড়া মার্কস-এঙ্গেলস থেকে শুরু করে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সমস্ত নেতা, কেউই কখনও দাবি করেননি যে, সমাজতন্ত্রে অর্থাৎ সাম্যবাদী সমাজের প্রথম স্তরে উপনীত হওয়ার পর নতুন এই সমাজ কোনও বিপদের সম্মুখীন হবে না। বরং তারা বারংবার এ কথাই বলেছেন যে, সমাজতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের একটা অন্তর্বর্তীকালীন স্তর। ফলে সব সময়ই প্রতিবিপ্লবের বিপদ এবং পুরনো ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বেশ কিছু গুরুতর বিচ্যুতির ফলে ঠিক সেটাই ঘটেছিল। প্যারি কমিউনের পতনের পর মার্কসের দেওয়া কিছু শিক্ষা আমি তুলে ধরছি। প্যারি কমিউনের সময়ই ১৮৭১-এর ১২ এপ্রিল মার্কস কুগেলম্যানকে লিখেছিলেন, "...আমি ঘোষণা করছি যে, ফরাসি বিপ্লবের পরবর্তী প্রচেষ্টায় প্রশাসনিক-সামরিক যন্ত্রটা আগের মতো হস্তান্তর করেই শেষ হবে না, তাকে চূর্ণ করতে হবে।" কিন্তু নেতৃবৃন্দ সে নির্দেশ পালন করেননি, যার পরিণামে প্যারি কমিউনের পতন ঘটে। এর পর গভীর যন্ত্রণা নিয়ে মার্কস লিখলেন, "কমিউন একটা বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণ করেছে যে, শ্রমিক শ্রেণি আগে থেকে তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটি বজায় রাখতে পারে না এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষায় তাকে কাজে লাগাতে পারে না।"

লেনিন এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পুরনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে ধ্বংস করে তিনি শ্রমিক শ্রেণির নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন— যা বেশ কয়েক দশক টিকে ছিল এবং দেখিয়ে দিয়েছিল শ্রমিক শ্রেণি কী অসাধ্যসাধন করতে পারে!

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনে আধুনিক সংশোধনবাদের বিপদ সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের হুঁশিয়ারি

রাশিয়া ও চিনে প্রতিবিপ্লবের আসন্ন বিপদ লক্ষ করে কমরেড শিবদাস ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, যেহেতু রাষ্ট্র এবং অন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গোটা উপরিকাঠামো নয়, তার অংশমাত্র, তাই রাষ্ট্র, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটলেই সাথে সাথে তা উপরিকাঠামোর সামগ্রিক পরিবর্তন ঘটায় না। ফলে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাথে একই সঙ্গে জীবনের সর্বদিককে ব্যক্তি-সম্পত্তিবোধজাত মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত করার জন্য পরিকাঠামোয় শ্রেণিসংগ্রাম তীব্র করা অপরিহার্য। তিনি বলেছেন,

"... সমাজতন্ত্র যত সংহত হবে এবং বিজয় অর্জন করবে ... শ্রেণিসংগ্রাম তত তীব্র ও গভীর রূপ নেবে এবং উপরিকাঠামোতে অর্থাৎ আদর্শগত-সাংস্কৃতিক জগতে আরও সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করবে।" (নির্বাচিত রচনাবলি, প্রথম খণ্ড)

এবং "... যদি অর্থনীতির প্রচণ্ড বৃদ্ধি ও

সাতের পাতায় দেখুন

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

ছয়ের পাতার পর

অগ্রগতির সাথে ... সামগ্রিকভাবে সমাজের সাংস্কৃতিক মনন, অর্থাৎ দর্শনগত উপলব্ধি থেকে শুরু করে সমাজের সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক মান ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি আচরণ এবং অভ্যাস সমানভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সার্বিক বিকাশের প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে উন্নত না করা যায়, তা হলে এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান গড়ে ওঠে, সে ব্যবধানের ফলে চিন্তাগত ক্ষেত্রে অনুন্নত মানের সৃষ্টি হতে বাধ্য। ... সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুন্নত মান থাকলে, তার দ্বারা সমস্ত পার্টিটা, সমস্ত শ্রমিকশ্রেণি বিভ্রান্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয়ে গিয়ে সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের ঝান্ডা উড়িয়েই সংস্কারবাদ ও শোধনবাদের রাস্তায় পুরোপুরি পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনতে পারে।" (নির্বাচিত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড)

তিনি আরও বলেছিলেন, সমাজতন্ত্রের আবরণের নিচে কাজ করে চলা বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা, ব্যক্তি-অধিকার এবং বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণার বিরুদ্ধে এবং পুরাতন সমাজের সংস্কৃতিগত-অভ্যাসগত-ঐতিহ্যগত রেশের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালাতে হবে। তা না হলে সব সময়ই উপরিকাঠামোর দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ধ্বংস করার জন্য প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ ঘটার বিপদের আশঙ্কা থাকবে। ওই দু'টি পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রে এই ঘটনাই ঘটেছে।

ভবিষ্যতে বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের ক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন ও মাও সে তুঙ-এর সুযোগ্য ছাত্র মহান মার্কসবাদী নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত আমাদের দল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ঝান্ডা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে রেখেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা আমাদের দেশে এবং বিশ্বের দেশে দেশে ছড়িয়ে দিয়ে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণি ও শোষিত মানুষকে শিক্ষিত ও সংগঠিত করার দায়িত্ব ইতিহাস আমাদের উপর ন্যস্ত করেছে। এ জন্য আমাদের কমরেডদের আদর্শগত, রাজনীতিগত, নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠতে হবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষা আমরা ভুলতে পারি না যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাণসত্তা নিহিত আছে এর সংস্কৃতি, উন্নততর সংস্কৃতির মধ্যে। তিনি বলেছেন, 'শুধু মার্কসবাদের কিছু কথা আউড়ে কোনও কাজ হবে না'। আমরা জানি যে, শুধু মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুঙ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের রচনাবলি পড়লেই কাজ হবে না। এসব থেকে সহজেই আমরা উদ্ধৃতি দিতে পারি। কিন্তু তাতে কাজ হবে না। যেটা দরকার তা হল আমরা সংস্কৃতিগতভাবে পরিবর্তিত হয়েছি, অর্থাৎ আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে, আমাদের সামাজিক জীবনে, বিবাহিত জীবনে, প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি, সন্তানের প্রতি এবং জনগণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে— জীবনের সর্বক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত হয়েছি। এর অর্থ হল জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা কমিউনিস্টের মতো আচরণ করছি।

এটা ঠিকই যে আমাদের পার্টি বড় হচ্ছে। পরিমাণগত দিক থেকে আমরা বেড়ে চলেছি। কিন্তু শুধু সংখ্যাবৃদ্ধিতে কাজ হবে না যদি না তা গুণগত দিক থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন না হয়। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিখিয়েছেন, আমাদের প্রতিটি মুহূর্তের চিন্তায়, আচার-আচরণে, আমাদের কাজে, কর্তব্যবোধে এবং আমাদের আবেগে হয় আমরা বুর্জোয়া, আর না হয় সর্বহারা বিপ্লবী। মনে রাখবেন, আমরা পুঁজিবাদের সৃষ্টি। পুঁজিবাদ আমাদের ঘিরে রেখেছে। এই পুঁজিবাদ চূড়ান্ত অধঃপতিত এবং দূষিত। প্রতি মুহূর্তে এই দূষণ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করছে, আমাদের দূষিত করছে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলছে। এ জন্য আমাদের সজাগ থাকতে হবে। আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের একটা উদ্ধৃতি সর্বত্র প্রচার করেছি যেখানে বলা হয়েছে, এমনকি সর্বোচ্চ নেতাও অধঃপতিত হতে পারেন যদি তিনি আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগেন এবং সংগ্রাম না করেন।

কমরেডস, আমি অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের স্থপতি মহান মার্কস ও এঙ্গেলসের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। কী ভাবে তাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন? কেন তাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন? তাঁরা নাম-যশের জন্য সংগ্রাম করেননি। তাঁরা শ্রমিকশ্রেণি ও শোষিত মানুষের মুক্তির জন্য এবং সমগ্র মানবসভ্যতার প্রগতির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। দৃঢ় সংকল্প ও অটল অধ্যবসায় নিয়ে বাস্তবিকপক্ষে উত্তাল প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে তাঁদের সাঁতার কাটতে হয়েছিল। তাঁরা দৃঢ়ভাবে সমস্ত ঝোড়ো আবহাওয়ার মোকাবিলা করেছিলেন। সর্বহারা বিপ্লবের একমাত্র স্বপ্ন নিয়ে তাঁরা প্রতিকূল দুনিয়ার বিরুদ্ধে সাহসের সাথে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের সংগ্রামে এক মুহূর্তের জন্যও দোদুল্যমানতা ও সংশয়ের লেশ মাত্র ছিল না। তাঁদের ছাত্র হিসাবে আজ তাঁদের সেই কঠোর সংগ্রামের পথ অনুসরণ করে তাঁদের সেই লক্ষ্য আমাদের পূরণ করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা আমাদের বার বার অনুশীলন করতে হবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুসরণ করে আমাদের উন্নততর সংস্কৃতি অর্জন করতে হবে। পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, সাহস ও আবেগের সাথে শ্রেণি ও গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে। যদি আমরা এই কাজ করতে পারি, যদি নিজেদের পরিবর্তন করতে পারি, যদি আমরা সেই পথনির্দেশ অনুযায়ী চলতে পারি, তবে বিপ্লব সফল করতে আমরা সফল হবো। সর্বত্র মানবতা আজ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কাঁদছে। পরিবর্তনের জন্য কাঁদছে। কে সেই মুক্তি দিতে পারে? একমাত্র শ্রেণি সচেতন বিপ্লবী সর্বহারাই মানবজাতির এই কান্না দূর করতে পারে। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে যেমন বলা আছে, এরাই হল পুঁজিবাদের কবর খননকারী। কিন্তু তাদের হাতিয়ার প্রয়োজন। সেই হাতিয়ার হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার আদর্শগত হাতিয়ার। আর তাদের সংস্কৃতি হল সর্বহারা সংস্কৃতি। এ জন্য অবশ্যই একটি প্রকৃত সর্বহারা পার্টি প্রয়োজন। সেই সর্বহারা পার্টির দায়িত্ব, পুঁজিবাদের কবর খনন করা। অন্য কথায়, সর্বহারা শ্রেণিকে আদর্শগত, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সংস্কৃতিগতভাবে প্রস্তুত করা— যাতে তারা তাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করতে পারে। এইভাবে যদি আমরা এগোতে পারি, সেটাই হবে মহান এঙ্গেলসের প্রতি সর্বোত্তম শ্রদ্ধা নিবেদন। আমি এখানেই শেষ করছি।

জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল

দুয়ের পাতার পর

বিদ্যুৎ উৎপাদনেও কেন্দ্রীকরণ

সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ইতিমধ্যেই নতুন রেগুলেশন হয়েছে। সেই রেগুলেশনে বলা হয়েছে, কেউ ইচ্ছা করলেই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার করতে পারবেন না। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে ও ব্যবহার করতে হলে লাইসেন্স নিতে হবে। সেই লাইসেন্সের শর্ত হচ্ছে, যিনি যতটুকু বিদ্যুৎ উৎপাদন করবেন তাকে তার সবটুকুই পূর্ব নির্ধারিত দামে ন্যাশনাল গ্রিডে বিক্রি করতে হবে। তারপর সেই বিদ্যুৎ তার ঘরে বাধ্যতামূলকভাবে লাগানো 'নেট মিটারিং' ব্যবস্থার মাধ্যমে তাকে বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির নির্ধারিত দামে কিনতে হবে।

এইভাবে নানা রকম শর্ত আরোপ করে বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের মুনাফার পাহাড় গড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে নতুন বিদ্যুৎ বিলে। এই বিল প্রতিরোধ না করতে পারলে জনজীবনে নেমে আসবে গভীর অন্ধকার।

জীবিত মানুষের অক্সিজেন যেমন প্রয়োজন, মানব সমাজকে সজীব রাখতে বিদ্যুতের প্রয়োজন তেমনই। সমাজের অগ্রগতির অন্যতম প্রধান উপাদানই বিদ্যুৎ। যে দেশে বিদ্যুতের ব্যবহার যত বেশি সে দেশ তত উন্নত। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সহজলভ্য না হলে জনসাধারণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবেন না। তাই আজ দাবি উঠছে, সর্বক্ষণ স্বল্প দামে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিতে হবে। আর তা নিশ্চিত করতে হলে জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন-২০০৩ ও তার সংশোধনী বিল ২০২১ প্রত্যাহারের দাবিতে ব্যাপক গ্রাহক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনও পথ সাধারণ মানুষের সামনে খোলা নেই।

স্বাস্থ্যসাথী

একের পাতার পর

টাকা সাফ হয়ে যেত এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীর চিকিৎসা অসম্পূর্ণ থাকত।

সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসার দাবি বহু দিনের এবং ৯০-র দশকের আগে তা অন্যান্য কিছু রাজ্যের সঙ্গে এই রাজ্যেও ছিল। সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার আউটডোর টিকিটের দাম ও বেড-ভাড়া চালু করে এবং হাসপাতালে পিপিপি মডেলে বেসরকারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই সুযোগ অবলুপ্ত করে এবং প্রায় পুরো চিকিৎসা পরিষেবা কিনতে মানুষকে বাধ্য করে।

২০১৫ সালে আপনার সরকার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা ফ্রি ঘোষণা করার পর থেকে নিম্নমানের ও অপ্রতুল হলেও সাধারণ মানুষ বিনা পয়সায় চিকিৎসা পেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০১৬ সালে আপনার সরকার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড চালু করে এবং ২০১৮ সালে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার অন্যান্য রাজ্যে পিএম জনআরোগ্য যোজনা কার্ড চালু করে। এতদসত্ত্বে ও সরকারি হাসপাতালে ফ্রি চিকিৎসার সুযোগ এত দিন ছিল। বর্তমানে বিমা নির্ভর এই প্রকল্পকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করার মধ্য দিয়ে এক দিকে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যের দায়িত্ব অস্বীকার করল। অন্য দিকে মানুষ হারালো তাদেরই টাকায় গড়ে ওঠা হাসপাতালে ফ্রিতে চিকিৎসার সুযোগ অর্থাৎ কার্যত কেড়ে নেওয়া হল জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অধিকার।

বিশ্বের মানুষের বিশেষ করে এই করোনা কালের তিক্ত অভিজ্ঞতায় এটা আজ প্রমাণিত যে, কোনও ধরনের বিমা-নির্ভর স্বাস্থ্য প্রকল্প জনগণের সাথে প্রতারণাই বেশি করে এবং তা কখনও জনসাধারণের স্বাস্থ্যের অধিকারের সমতুল্য হতে পারে না। যেখানে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সমস্ত মানুষেরই ফ্রিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ ছিল, সেখানে জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে প্রথমে বহুজাতিক বিমা কোম্পানি, থার্ড পার্টি এজেন্সি (টিপিএ) এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্য ব্যবসার কর্পোরেট মালিকদের সর্বোচ্চ মুনাফা সুনিশ্চিত করার পরে, যদি কিছু ছিটেফোঁটা থাকে, সেটুকু রোগীর জন্য ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ মালিকদের মুনাফার লোভের শিকার হয়ে সাধারণ মানুষ কার্যত বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে পরিষেবা পাওয়ার প্রকৃত চিত্র হচ্ছে, গত ভোটের পর থেকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেখলেই বেসরকারি হাসপাতাল বলছে 'বেড খালি নেই', অন্য দিকে এই হাসপাতালগুলি লক্ষ লক্ষ টাকা বকেয়া বিল না পেয়ে কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে এবং স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করেছে। আমরা জানি, বিমাকার্ড সব সময়ই নানা শর্ত নির্ভর এবং বিমা কোম্পানি ও থার্ড পার্টির মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। ফলে মানুষের স্বাভাবিক চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ ছাড়াও যে প্রশ্নগুলি উঠছে তা হল, ৫ লক্ষ টাকা শেষ হলে পরিবারের বাকিরা চিকিৎসা পাবেন কি না, অন্য রাজ্যের মানুষ এই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন কি না এবং স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও মানুষ যে হয়রানির শিকার হন তা দূর হবে কি না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দাবি ঃ

১) সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বাধ্যতামূলক করা বন্ধ করুন।

২) জনগণের ট্যাক্সের টাকা বিমা কোম্পানি ও থার্ড পার্টি এজেন্সির মুনাফা গড়ার কাজে না দিয়ে সেই টাকায় স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতি সাধন করে জনসাধারণের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার সুনিশ্চিত করুন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

মহান নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে ৭ নভেম্বর দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মহান লেনিন ও স্ট্যালিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। ডানদিকে কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে দলের অফিসে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ।

কলকাতায় শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য অফিসের সামনে সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ।

সংযুক্ত কিসান মোর্চার পশ্চিমবঙ্গ চ্যাপ্টার গঠিত

দেশের চলমান কৃষক আন্দোলনকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিত করে আরও তীব্রতর করে তোলার জন্য ৫ নভেম্বর কলকাতার জর্জ ভবনে সংযুক্ত কিসান মোর্চার পশ্চিমবঙ্গ চ্যাপ্টার গঠনের উদ্দেশ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ আই কে কে এম এস, এ আই কে এস সহ মোট পঁচিশটি সংগঠন এই সভায় যোগদান করে। সংযুক্ত কিসান মোর্চার অন্যতম নেতৃত্ব কমরেড হান্নান মোল্লা, এ আই কে কে এম এস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সভায় বিভিন্ন সংগঠনের ষোলো জন প্রতিনিধি নিয়ে সংযুক্ত কিসান মোর্চার পশ্চিমবঙ্গ চ্যাপ্টার গঠিত হয়। এ আই কে কে এম এস-এর প্রতিনিধি হিসাবে কমরেড গোপাল বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গ চ্যাপ্টারে নির্বাচিত হন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষক আন্দোলন আরও তীব্রতর করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়।

আগরতলা পৌর নির্বাচনে ৫টি আসনে লড়ছে এস ইউ সি আই (সি)

আগরতলা পৌর কর্পোরেশনে দীর্ঘ সিপিএম আমলে নাগরিক পরিষেবা যে তিমিরে ছিল, বর্তমান বিজেপি আমলেও তা সেই তিমিরেই। নাগরিক পরিষেবা উন্নয়নের দাবিতে এবং পৌরকর বৃদ্ধির প্রতিবাদে কর্পোরেশনের ভিতরে প্রকৃত বিরোধী ভূমিকা পালন করতে এস ইউ সি আই (সি) মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়েছে দলের পক্ষ থেকে। ২৪নং ওয়ার্ডে প্রার্থী কমরেড ভবতোষ দে, ৩৯-এ কমরেড মিঠুরানী ভৌমিক, ৪৫-এ কমরেড শুক্লা দেব (চক্রবর্তী), ৪৭-এ কমরেড আশিষ সরকার এবং ৪৮ নং ওয়ার্ডে কমরেড উমা দেবনাথ (চৌধুরী)।

জেলায় জেলায় কৃষক জাঠা

পূর্ব বর্ধমান ঃ কৃষক জাঠার সমাপ্তি কর্মসূচি ১ নভেম্বর পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরে সুসজ্জিত সাইকেল মিছিলের মধ্য দিয়ে কার্জন গেটে শেষ হয়। সেখানে একটি সভা হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন জেলা সভাপতি অরবিন্দ সাহা, সম্পাদক মোজাম্মেল হক প্রমুখ।

হাওড়া ঃ কেন্দ্রীয় কৃষি-আইনে খাদ্যদ্রব্যের মজুতদারিকে বৈধতা দেওয়ার বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের উদ্যোগে ১ নভেম্বর হাওড়া জেলার শ্যামপুরে বিদ্যাসাগর মোড়ে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। প্রায় এক বছর ধরে ধারাবাহিক কৃষক আন্দোলনের উপর রাজনৈতিক ও পুলিশি দমন পীড়নের প্রতিবাদে এই সভায় তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির নেতা উৎপল প্রধান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন হাওড়া জেলা সম্পাদক প্রলয় মাইতি। সভাপতিত্ব করেন কৃষক নেতা প্রদীপ মণ্ডল।

স্কুলে মধুচক্রের প্রতিবাদ করায় প্রিন্সিপাল খুন তীব্র বিক্ষোভ ওড়িশায়

ওড়িশার কালাহান্ডি জেলার এক বেসরকারি স্কুলের মালিক এবং স্থানীয় বিজেডি বিধায়কের মদতে চলা মধুচক্রের প্রতিবাদ করেছিলেন স্কুলের প্রিন্সিপাল মমিতা মেহের। পরে ওই দুষ্টচক্র মমিতা মেহেরকে অপহরণ করে হত্যা করে। এই বর্বরোচিত হত্যার প্রতিবাদে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস রাজ্যের সর্বত্র ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে ৫ নভেম্বর পাটনাগড় সাব কালেকটরের অফিসের সামনে ৬ শতাধিক ছাত্র-যুব-মহিলা বিক্ষোভ দেখায়।

গবেষণায় মারাত্মক আঘাত হেনেছে কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত বড়ুয়া কমিশন

নন-নেট ফেলোশিপ সংক্রান্ত গৌতম বড়ুয়া কমিশন সম্প্রতি সুপারিশ করেছে, ইউনিভার্সিটির এন্ট্রান্সের পরিবর্তে এখন কেন্দ্রীয় নেট পরীক্ষার মাধ্যমেই এই ফেলোদের নেওয়া হবে, নাম হবে নেট-টু ফেলোশিপ। এর পাশাপাশি এম ফিল স্কলারদের ফেলোশিপ বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাবও করা হয়েছে। এর তীব্র প্রতিবাদ করে ডেমোক্রেটিক রিসার্চ স্কলারস অর্গানাইজেশন (ডিআরএসও)-র পক্ষে অর্ঘ্য দাস ৪ নভেম্বর এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন,

বর্তমানে দেশজুড়ে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স দিয়ে ভর্তি হওয়া স্কলারদের ইউজিসি নন-নেট ফেলোশিপ দেয়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও 'রেট' পরীক্ষার মাধ্যমে গবেষক নিয়োগ করে। এই স্কলাররাই সারা দেশের গবেষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নন-নেট স্কলারদের মাসে মাত্র ৮ হাজার টাকা ফেলোশিপ দেওয়া হয়, এটাও অত্যন্ত অনিয়মিত। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে হাতে গোনা কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে স্কলারদের কোনও ফেলোশিপই নেই! অথচ নেট পাওয়া স্কলারদের ফেলোশিপ মাসে ৩১ হাজার টাকা। গবেষকদের মধ্যে এই বৈষম্যের প্রতিবাদে এবং সকল স্কলারদের জন্য উপযুক্ত ফেলোশিপের দাবিতে ডিআরএসও দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলন করে আসছে। অধ্যাপকরাও নানা সময়ে এবং সম্প্রতি সর্বভারতীয় স্কলার কনভেনশনে এই বিষয়ে সোচ্চার হয়েছেন।

২০১৫ সালে অর্থাভাবের অজুহাতে ইউজিসি নন-নেট ফেলোশিপ বন্ধকরে দেওয়ার ঘোষণা করে। তখন থেকেই দেশজুড়ে ছাত্র ও গবেষক সমাজ ব্যাপক প্রতিবাদ করেছেন। তারপরেই অধ্যাপক গৌতম বড়ুয়ার নেতৃত্বে নন-নেট ফেলোশিপ রিভিউ কমিশন তৈরি হয়, যার একটি ঘোষিত উদ্দেশ্যই ছিল নন-নেট ফেলোশিপের পরিসর আরও বাড়ানো। অথচ দীর্ঘ ছয় বছর পরে কমিশন যে নিদান নিয়ে এল তা বাস্তবায়িত হলে গোটা গবেষক সমাজের ওপর এক বিরাট আঘাত নেমে আসবে।

এই প্রস্তাবে বাস্তবে গবেষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের প্রশ্নটি মারাত্মক খর্ব হবে এবং এম ফিল ফেলোশিপ বন্ধহয়ে যাবে। বর্তমানে প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ স্কলার ফেলোশিপ পায় না, এই সংখ্যাটা আরও বাড়বে, প্রান্তিক স্কলাররা পুরো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, কোচিং ব্যবসার রমরমা বাড়বে।

গবেষক আন্দোলনের চাপে কমিশন নন-নেট স্কলারদের ফেলোশিপ সামান্য বাড়ানোর কথা বলেছে ঠিকই, কিন্তু তার পরিমাণ রাখা হয়েছে জেআরএফ স্কলারদের ফেলোশিপের অর্ধেক মাত্র, যা এই ব্যাপক বৈষম্যকেই আরও পাকাপোক্ত করবে এবং সার্বিক ভাবে গবেষণায় ব্যয়বরাদ্দ এবং বৈচিত্রের পরিসর দুটোই আরও কমবে, দীর্ঘমেয়াদে গবেষণার সার্বিক অগ্রগতিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com